রাখাল ছেলে মোহর পেলে - আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় ৮ জুলাই, ২০১৮, অশোককুমার দাস

স্বাধীনতার তখনও এক বছর বাকি। এক কনকনে শিতের দুপুরে ভরতপুরের মহারাজা সওয়াই ব্রজেন্দ্র সিংহ সপার্ষদ বায়ান শহরের ১১ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে হল্লানপুরা গ্রামে শিকার করতে এসেছিলেন। প্রায় এক মাস পর তাঁদের ফেলে যাওয়া কার্তুজের খোল খুঁজতে গিয়ে তিন রাখাল বালক দিতামল, বাবু ও তুলসী একটি পতিত জমির উঁচু আলের কাছে একটি ভারী, নলওয়ালা, ঘটির মত ধাতব পাত্র খুঁজে পায় -তার ভেতরে যা ছিল সেগুলিকে দেখে রাখাল বালকদের মনে হয় বিবর্ণ পিতলের বোতাম। কিন্তু গ্রামে ফিরে বড়দের দেখাতেই তারা বুঝতে পারেন যে সেগুলি পুরনো কালের সোনার মুদ্রা। পাত্রটি থেকে ২৫৮টি মুদ্রা গ্রামের মধ্যে বিলি করা হয় - স্যাকরারা সেগুলি গলিয়ে ফেলে গয়না তৈরী করে। খবর ক্রমে পৌঁছায় মহারাজার কানে। তিনি বিশ্বস্ত লোকা পাঠিয়ে তামার ঘটিসহহ মুদ্রাগুলিকে উদ্ধার করে আনেন। ২৫৮ গলিয়ে ফেলার পরেও দেখা যায় ঘটিতে ১৮২১ টি মুদ্রা রয়েছে- স্থানীয় বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালার কর্মীরা মহারাজাকে জানান যে মুদ্রাগুলি বেশ প্রাচীন। মহারাজ একজন উপযুক্ত মুদ্রাবিশারদের খোঁজ করেন এবং ১৯৪৭ এর মে মাসে পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনন্ত সদাশিব আলতেকরকে আমন্ত্রন করে নিয়ে আসেন। সেই সময় আলতেকর ভারতের অগ্রগণ্য মুদ্রাবিশেষজ্ঞ।

আলতেকর মুদ্রাগুলি বিশ্লেষণ করে জানান যে সেগুলি গুপ্ত সম্রাটদের দ্বারা প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা এবং সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মহরাজার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে তাঁরই অনুরোধমতো আলতেকর মুদ্রাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা শুরু করলেন - এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করলেন অপর এক প্রখ্যাত মুদ্রাবিশারদ পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত। অলতেকরের অনুরোধে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব নিরীক্ষণের ডিরেক্টর মর্টিমার হুইলার এবং ন্যাশানাল মিউজিয়ামের সুপারিনটেন্ডেন্ট বাসুদেবশরণ অগ্রবাল তাঁদের মুখ্য আলোকচিত্রকর গোবিন্দ তিওয়ারিকে মুদ্রাগুলির ছবি তুলতে পাঠালেন। আলতেকরের অনুরোধে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ কলম্বুর শিবরামমূর্তি মুদ্রার সাংকেতিক চিহ্ন ও সম্রাট- সম্রাজ্ঞী -কুলদেবীর অবয়বের রেখচিত্র আঁকলেন। আর এক দিকপাল বোম্বাই এর প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামের নির্দেশক মোতি চন্দ্র এঁকে দিলেন মুদ্রায় উৎকীর্ণ সম্রাট- সম্রাজ্ঞীর পোশাকআশাক, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাব ইত্যাদির বাস্তবানুগ ছবি। ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ হল মুদ্রাগুলির ক্যাটালগিং এর কাজ।

স্বাধীনতার পরে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েও ভরতপুরের মহারাজা সওয়াই ব্রজেন্দ্র সিংহ উঁচু মানের ক্যাটালগ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আলতেকরারে বাছাই করা ৪৪৯ টি মুদ্রার ছবি পাঠানো হল লন্ডনের চিজউইক প্রেসে। সেখানে বিশেষ ধরণের কাগজে কলোটাইপ পদ্ধতিতে ১০০০ কপি ক্যাটলগ ছাপা হয় (এই পদ্ধতিতে এর বেশি কপি ছাপা যেতনা)। ৩৬ পাতার মুখবন্ধ, ১৫৮ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ভূমিকা ও ৩৬৩ পাতা জুড়ে মুদ্রার বিশদ বিবরণ ছাপা হয়। ক্যাটলগের অপর একটি সংস্করণ এলাহাবাদের ল জার্নাল প্রেস থেকেও ছাপা হয়। এইভাবে ক্যাটালগ তৈরীর কাজ শেষ হয় ১৯৫১ সালে। ঐ বছরের মার্চ মাসে মাহারাজা ২০৯ টি বাছাই করা মুদ্রা ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের হাতে তুলে দেন -উদ্দেশ্য সদ্য তৈরী হওয়া ন্যাশানাল মিউজিয়ামে গবেষক ও সাধারণ মানুষ যাতে মুদ্রাগুলি দর্শন করতে পারেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে উৎসর্গীকৃত ক্যাটালগটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এইভাবে এক বিদ্যোৎসাহী ইতিহাসপ্রেমী মহারাজা, কতিপয় অগ্রগণ্য মুদ্রাবিশারদ, শিল্পী ও ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে এই দেশের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার ভান্ডারের বিস্তারিত ও সচিত্র বিবরণ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

আলতেকারের পরামর্শমতো মহারাজা সওয়াই ব্রজেন্দ্র সিংহ ভরতপুরের দরবারের জন্য ৭৮টি স্বর্ণমুদ্রা রাখেন; ৭৮টি স্বর্ণমুদ্রা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলা ভবন মিউজিয়ামে, ২০টি প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মিউজিয়ামে, ১৮টি পটনা বিশ্ববিদ্যলয়ে, ও ৫৯টি পটনা মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়, ১০০'র কাছাকাছি মুদ্রা সংরক্ষিত হয় জয়পুর মহরাজার সংগ্রহশালার একটি ক্যাবিনেটে।

হল্লানপুরার নিকটবর্তী অঞ্চলে গুপ্তযুগীয় কোন মন্দির বা অন্য কোন প্রাচীন স্থাপত্য পাওয়া যায়নি, তবে ১১-১২ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে বিজয়গড়ে গুপ্ত আমলের দুটি লেখ শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন হতে পারে যে এই বিজয়গড়ের কোনো অঞ্চলশাসক স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের প্রথম দিকের হূন আক্রমণের সময় স্বর্ণমুদ্রার এই ভান্ডার মাটির তলায় লুকিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে মুদ্রাগুলি মাটির তলায় লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়।

এই মুদ্রাভান্ডারে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিকে বিশ্লেষণ করে আলতেকার কয়েকটি সূত্র পান- মুদ্রাগুলি উজ্জ্বল ও আনকোরা; প্রথম চন্দ্রগুপ্ত থেকে কুমারগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্ত শাসকদের দুই একটি ধরণ বাদ দিয়ে প্রায় সব রকমের মুদ্রাই এই মুদ্রাভান্ডারে উপস্থিত; মুদ্রাভান্ডারের মুদ্রাগুলির মধ্যে সব থেকে নবীন দুটি মুদ্রা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের প্রথম দিককার - এই সূত্রগুলি থেকে আলতেকার অনুমান করেছিলেন যে মুদ্রাগুলি স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে কোনো রাজপুরুষের অধিকারে রক্ষিত

ছিল। বায়ানার স্বর্ণমুদ্রার ভান্ডারে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ১০টি, সমুদ্রগুপ্তের ১৮৩টি, কাচ এর ১১টি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ৯৮৩টি, প্রথম কুমারগুপ্তের ৬২৮টি এবং স্কন্দগুপ্তের একটিমাত্র মুদ্রা রক্ষিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের ১৮৩টির মধ্যে ১৪৩ স্ট্যান্ডার্ড শ্রেণীর, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ৯৮৩টি মুদ্রার মধ্যে ৭৯৮টি ধনুর্ধারী শ্রেণীর আর প্রথম কুমারগুপ্তের ৬২৮টি মুদ্রার ৩০৫টি অশ্বারোহী এবং ১৮৩টি ধনুর্ধারী শ্রেণীর। এই ডেফিনিটিভ বা সাধারণভাবে প্রচলিত মুদ্রাগুলি ছাড়াও সমুদ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ প্রজাতির মুদ্রা, সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত শ্রেণীর মুদ্রা, সমুদ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তের বাঘ শিকার, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সিংহ শিকার এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গন্ডার শিকার শ্রেণীর স্মারক বা কমেমোরেটিভ মুদ্রাও বায়ানার ভান্ডারে পাওয়া গেছে। তবে বায়ানার ভান্ডারে প্রাপ্ত বিরলতম মুদ্রা হল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের চক্রবিক্রম শ্রেণীর মুদ্রা যা এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি। আরাধ্য দেবতা হিসাবে চক্রধারী বিষ্ণুর প্রকাশ এই প্রথম। বলা বাহুল্য যে বায়ানার স্বর্ণমুদ্রার এই ভান্ডারে প্রাপ্ত মুদ্রা এবং তার উপর ভিত্তি করে তৈরী হওয়া ক্যাটালগ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ। কেবল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয়, প্রাচীন ভারতে মুদ্রানির্মাণ ও তার শৈল্পিক গুণের ঐতিহ্য এই মুদ্রাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। ২৫৮টি স্বর্ণমুদ্রা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া ও গলিয়ে ফেলার জন্য গ্রামবাসীদের ৪৫টাকা করে জরিমানা করা হয়েছিল এবং তার জন্য রাজকোষে ১২৬৮৩ টাকা জমা পড়ে। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে যে বাকি ১৮২১ স্বর্ণমুদ্রা গ্রামবাসীরা গলিয়ে ফেলেনি - সেগুলিকে উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। গ্রামবাসীগণ এবং উদ্ধারকর্তা মহারাজা ও সংশ্লিষ্ট পন্ডিতকূলের এই কারণে সাধুবাদ প্রাপ্য।

কাকে বলে ঐতিহ্য ঃ

ঐতিহ্য শব্দটির ইংরাজি পরিভাষা হল 'heritage'। প্রচলিত এবং অগ্রগণ্য অভিধানগুলিকে বিশ্লেষণ করে ঐতিহ্য শব্দ বা অভিধাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূর্ত বা বিমূর্ত সংরক্ষণযোগ্য মূল্যবান সম্পত্তিকে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই সম্পত্তি কোন স্পর্শযোগ্য মূর্ত বস্তু হতে পারে বা কোনো বিমূর্ত, যাকে ধরা বা স্পর্শ করা যায়না এরূপ কোন ধারণা বা বিশ্বাস বা প্রথা বা আচার হতে পারে। ঐতিহ্য'র জন্য চিহ্নিত মূর্ত বস্তু বা স্থান বা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক বিষয়টিকে প্রাচীন হতে হবে, অন্যভাবে বললে ঐতিহ্য'র অন্যতম চরিত্র তার প্রাচীনত্ব বা পৌরাণিকতা এবং বর্তমান কালে তার স্থায়িত্ব।

সহজেই বোঝা যায় যে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত কোন বস্তুর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্টা থাকতে হবে। প্রথমত, ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত বস্তু বা ধারণাটি পূর্বতন প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাহিত হবে; দ্বিতীয়ত, বস্তু বা ধারণা বা বিশ্বাসটিকে ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক (এবং প্রাকৃতিক) দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে; তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক (এবং প্রাকৃতিক) গুরুত্বের কারণে বস্তু বা ধারণা বা বিশ্বাস বা আচারটিকে সংরক্ষণের যোগ্য হতে হবে।

আধুনিক চর্চায় ঐতিহ্য বা 'heritage' কে দুভাগে ভাগ করা হয় মূর্ত বা 'tangible' এবং বিমূর্ত বা 'intangible'। এর মধ্যে মূর্ত ঐতিহ্য বা 'tangible heritage' কে স্পর্শ করা যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় - প্রাচীনকালের কোনো মৃৎপাত্র, বা মাটি বা ধাতুর তৈরী কোনো মূর্তি, মাটির তলায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত কোনো ধ্বংসস্তূপ, মাটির উপরে অস্তিত্বমান অতীতের কোনো সৌধ, কোনো প্রাসাদ বা দুর্গ, কোনো চিত্রকলা -সবই মূর্ত ঐতিহ্য বা 'tangible heritage' এর পর্যায়ভূক্ত।

অন্যদিকে বিমূর্ত ঐতিহ্য বা 'intangible heritage' কে স্পর্শ করা যায়না, এগুলি অধরা তাই বিমূর্ত। সাংস্কৃতি নয়ে কোনো বিশ্বাস, প্রথা বা আচার বিমূর্ত ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে। এই প্রকার ঐতিহ্য কালের গতিপথে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত হয় কখনও কখনও নিঃশব্দে এবং অবচেতনভাবে কখনও বা সচেতনভাবে। বিমূর্ত ঐতিহ্যের সব থেকে বড় নিদর্শন হল আঞ্চলিক ভাষা - বর্তমান পৃথিবীতে কেবল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় আষ্টম-নবম শতক থেকে নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা তার অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে - এই ক্ষেত্রে ভাষা সংরক্ষণের জন্য কোনো কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। ভাষা ছাড়াও সংস্কৃতির নানারকম চিহ্ন যেমন পোষাক পড়ার অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস, গান, কবিতা, কিংবদন্তি, পরম্পরাগত উপদেশবাক্য, অতীতের গৌরবগাথা বা পৌরাণিক কাহিনী, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি, অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস - সব কিছুই বিমূর্ত ঐতিহ্য'র পর্যায়ভূক্ত।

অতীতকালের সব স্পর্শযোগ্য বস্তু বা অতীতকালের যে কোনো বিমূর্ত সাংস্কৃতিক আচার মানেই কিন্তু তা ঐতিহ্য এর পর্যায়ভূক্ত নয়। কোন গ্রাম বা নগর বা কোনো অঞ্চল বা দেশ বা সর্বোপরি বিশ্বের মানুষ যদি অতীতের কোনো মূর্ত বস্তু বা অতীতকাল থেকে পরম্পরাগতভাবে চলে আসা কোনো সাংস্কৃতিক ধারণা বা আচার বা বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সংরক্ষণ করে তবেই তা ঐতিহ্য হয়ে উঠতে পারে, নতুবা স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় যে মানুষই ঠিক করে অতীতের কোন বস্তু বা পরম্পরাগতভাবে চলে আসা কোন বিশ্বাস বা আচার ঐতিহ্যের মর্যাদায় ভূষিত হবে।

এখন প্রশ্ন অতীতের কোনো বস্তু এবং পরম্পরাগতভাবে চলে আসা প্রচলিত বিশ্বাস বা আচার বা প্রথাকে কি কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মের ভিত্তিতে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করা হয়? বা সকল মানুষই কি ঐতিহ্যকে একই চোখে দেখে? উত্তরে বলা যায় যে মানুষভেদে ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করার রীতি ভিন্ন। ঐতিহ্য বিষয়ক পন্ডিত ও ব্যবস্থাপকগণ ঐতিহ্যের বস্তু বা প্রথাকে যেভাবে দেখবেন বা মূল্যায়ণ করবেন, একজন সাধারণ মানুষ সেভাবে তা করবে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে একজন চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ যেভাবে ভ্যান গগ বা গণেশ পাইনের আঁকা কোনো ছবিকে চিনে তাকে ঐতিহ্য রূপে বিশ্লেষণ বা চিহ্নিত করতে পারবেন কোনো সাধারণ মানুষ তা পারবে না। অন্যদিকে মাটির তলা থেকে উদ্ধার হওয়া কোনো প্রাচীন মূর্তির বা মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তাকে ঐতিহ্য রূপে মর্যাদা দেওয়া ও সংরক্ষণ করার ক্ষমতা কেবল প্রত্নতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকদেরি থাকবে - সাধারণ চোখে ঐ সকল মূর্ত বস্তুর আর্থিক গুরুত্ব ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব নেই। সুতরাং বা যায় যে অতীতের কোনো বস্তুকে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত হতে হলে যে মানুষ বা মানবসমাজ তাকে দেখছে তার মূল্যবোধ বা 'value judgement' এর উপর নির্ভর করতে হয়। এইদিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকটি মূর্ত বা 'tangible' বস্তুর ' heritage' হয়ে ওঠার পেছনে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিমূর্ত ধারণা সক্রিয় থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনাকে উদাহরণ রূপে তুলে ধরা যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বিখ্যাত ইতালিয় চিত্রকর টিজিয়ানো ভেসেল্লিও' বা টিসিয়ান এর আঁকা একটি চিত্র সাধারণভাবে দেওয়ালে ঝোলানো ছিল যতক্ষণ না একজন চিত্রকলা গবেষক চিত্রটিকে সঠিকভাবে চিনতে পারেন এবং ঐতিহ্য হিসাবে তার গুরুত্বটি কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পারেন। এছাড়াও শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো মূর্ত বিষয় যেমন চিত্র বা ভাস্কর্য এবং যে কোনো বিমূর্ত বিষয় যেমন গান ঐতিহ্যের স্থান পাবে কিনা তা নির্ভর করে ব্যক্তি বা সমাজের নান্দনিক বিশ্লেষণের উপর। এই নান্দনিক বিশ্লেষণ ব্যক্তিভেদে বা সমাজভেদে ভিন্ন হতে পারে। বোঝাই যায় দর্শক বা শ্রোতা কোনো একটি বস্তু বা বিষয়কে কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন তার উপর নির্ভর করে ঐতিহ্য'র মানদন্ড।

ঐতিহ্য ও ইতিহাস কি এক? অনেকেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে এক করে দেখেন বা দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু আদতে ইতিহাস ও ঐতিহ্য এক নয়। ইতিহাস বস্তুত অতীত সম্পর্কিত চর্চা, বিশ্লেষণ ও তাকে উপস্থাপন। ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানবজীবন ও মানবসমাজের সকল বিষয়কে নিয়ে। ঐতিহ্য ঠিক তা নয়। অনেক ঐতিহাসিকই বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এবং ঐতিহ্যমন্ডিত স্থলে ইতিহাসকে তুলে ধরার বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে 'bad history' রূপে চিহ্নিত করে তার থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তথা ভৌগোলিক ডেভিড লোয়েনথাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Heritage Crusade and the Spoils of History' নামক গ্রন্থে সুন্দরভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্য'র মধ্যে পার্থক্যগুলি তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি লিখছেন যে ঐতিহ্য কোনভাবেই ইতিহাস নয়। তিনি লিখছেন 'it is not an inquiry into the past, but a celebration of it... a profession of faith in a past tailored to present day purposes'। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ঐতিহ্য'র কারবারিগণ পেশার প্রয়োজনে অতীতকে বিশ্বাস করে তাকে উদযাপন করে, ঐতিহ্য অতীতকে অনুধাবনের জন্য ব্যবহৃত হয়না। বস্তুতপক্ষে বর্তমানের প্রয়োজনে জাতীয় বা আঞ্চলিক কোনো স্বার্থে অতীতকে নতুন করে মোড়ক দেওয়ার প্রচেষ্টাই হল ঐতিহ্য। এই প্রয়োজন আর্থিক বা বাণিজ্যিক হতে পারে, জাতীয় বা আঞ্চলিক ভাবাবেগজনিত হতে পারে।

বস্তুত আধুনিককালে ঐতিহ্য নামক অভিধাটি সম্পর্কে ধারণা পাল্টাচ্ছে, আইন এবং নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহ্য বা 'heritage' কে নতুন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা চলছে। জন কারমান যেমন মনে করেন যে চিহ্নিতকরণ বা শ্রেণীকরণের মধ্যে দিয়েই ঐতিহ্যকে সৃষ্টি করা হয় যাকে তিনি বলছেন 'categorising'। যে সকল স্থান বা বস্তু বা ধারণা বা পরম্পরার একাধিক আইনী ও নৈতিক বা 'moral' বাধ্যবাধ্যকতা থাকে তাকেই ঐতিহ্য রূপে দেখা হয়। কোন একটি স্থান বা বস্তু বা ধারণা বা রীতি তখনই ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করে যদি ১) তাকে সক্রিয়ভাবে ও সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়, ২) তাকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং তার ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি বর্তমান থাকে, ৩) এবং তাকে দর্শন বা শ্রবণ বা উপলব্ধি করা যায় যাতে করে পৃথিবীর এক ঐতিহ্য হিসাবে তার গুরুত্ব তথা গুণ প্রশংসিত হতে থাকে।

ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করা হয় স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক স্তরে। ঐতিহ্যের শ্রেণীকরণ ও চিহ্নিত করণের নানান ভিত্তি বা মানদন্ড রয়েছে। স্থান বা বস্তু বা রীতিনীতির অন্তঃস্থিত চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যেমন তার গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, প্রাচীনত্ব, উৎকর্ষতা ও সামাজিক অবদান ঐ মানদন্ডকে নিরূপণ করে। যে মুহূর্তে কোন মূর্ত বস্তু বা কোনো স্থান বা কোনো বিমূর্ত আচার বা রীতি ঐতিহ্য এর তকমা লাভ করে সেই মুহূর্ত থেকে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে যেতে থাকে। ঐতিহ্যস্থল বা বস্তু বা বিষয়টিকে অন্য এক মর্যাদার চোখে দেখা হতে থাকে, তাকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে, সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়। সরকারীভাবে কোন স্থান বা বস্তু বা রীতি বা আচারকে যখন ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করা হয় তখন নিশ্চিতভাবেই তার সঙ্গে সম্পৃক্ত গোষ্ঠী, সমাজ, অঞ্চল, রাষ্ট্র বা জাতির

কাছে তার গুরুত্ব বা তাৎপর্য্যটিকে অণুধাবন করা হয়। আবার অন্যদিকে ঐতিহ্য চিহ্নিতকরণের এই সরকারী প্রক্রিয়াতে কোন একটি সমাজের স্মৃতির সঙ্গে পরাম্পরাগতভাবে জড়িত কোন রীতি বা আচার বা পদ্ধতি অথবা কোনো বিশেষ সামগ্রী অনেক ক্ষেত্রে বাদ যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একদম স্থানীয় পর্যায়ে কোনো কোনো মানবসমাজে দীর্ঘদিন ধরে নানা খেলা প্রচলিত থাকে - যেমন গ্রাম বাংলায় ছোটো ছোটো ছেলেরা গুলি খেলে এবং এই গুলি খেলা ছোটোবেলার স্মৃতিতে অঙ্গীভূত থাকে - এই খেলার একটি সামাজিক প্রভাব অবশ্যই আছে। কিন্তু সরকারী ঐতিহ্য'র তালিকায় এই খেলাটি কিন্তু স্থান পায়না। এইদিক দিয়ে বিচার করলে ঐতিহ্য'র সরকারী চিহ্নিতকরণ বহু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামাজিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে - সেক্ষেত্রে সরকারী তকমা ব্যতিরেখেই ঐ প্রকার সামাজিক ঐতিহ্য বজায় থাকে অথবা হারিয়ে যায়। যেমন মোবাইল ফোনের যুগে গুলি খেলা বা গুলি ডান্ডা খেলার রেওয়াজ নিঃসন্দেহে কমে আসছে।

সাম্প্রতিক চর্চায় ঐতিহ্যের সরকারী শ্রেণীকরণের এক ভিন্ন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় - মূর্ত বস্তু যেমন বাড়িঘর, নগর, দুর্গ, প্রাচীন কোনো দ্রব্য এবং বিমূর্ত কোনো প্রথা বা রীতি বা আচার বা শিল্পসৃষ্টি এগুলি মানুষ দ্বারা তৈরী বা সৃষ্ট - এই প্রকার মূর্ত এবং বিমূর্ত ঐতিহ্যকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে মানুষ যা তৈরী করেনি এরূপ ঐতিহ্যকে বলা হয় প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের এই বিভাজন যথেষ্ট সুস্পষ্ট হলেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রাকৃতিক জগতের কি কোনো সামাজিক তাৎপর্য্য রয়েছে যে তাকে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করতে হবে। সাধারণ বিচারে গুরুত্ব হয়তো নেই তবে একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে প্রাকৃতিক জগতের সামাজিক তাৎপর্য্যকে অনুধাবন করা যেতে পারে। এখানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে পার্থক্য এবং উভয় ঐতিহ্যের সামাজিক গুরুত্ব উদাহরণের মধ্যে দিয়ে দেখা যেতে পারে।

বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের মির নামক স্থানের একটি দুর্গ হল মির ক্যাসেল (Mir Castle); অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ তথা শোভার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গ্রেট বেরিয়ার রিফ (Great Barrier Reef) - উভয়েই ইউনেসকো বা 'UNESCO' দ্বারা বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র বা 'World Heritage Site' নামে চিহ্নিত। মির দুর্গটি মিরয়ানকা নদী সংলগ্ন একটি হ্রদের ধারে গ্রোডনা অঞ্চলে অবস্থিত যা এখন বেলারুশের অন্তর্ভূক্ত। পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের গোড়ায় মধ্য ইওরোপীয় গথিক শৈলীতে দুর্গটি নির্মিত হয়। পরে দুর্গটির সংস্কার হয় রেনেসীয় (Renaissance) এবং বারোক (Baroque) শৈলীতে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের রাশিয়া অভিযানের সময় দুর্গটির প্রভূত ক্ষতি হয় এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পরে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে সন্নিহিত বাগান ও জলাশয় সহ দুর্গটির পুনরায় সংস্কার সাধন হয়। মধ্য ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গথিক, রেনেসীয় ও বারোক শৈলীর এই দুর্গটি ঐতিহ্য রূপে পরিগণিত হওয়ার যাবতীয় সরকারী আইনসঙ্গত মানদন্ড অতিক্রম করে এবং ২০০৮ সালে ইউনেসকো 'World Heritage Site' রূপে চিহ্নিত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারী অর্থানুকূল্য লাভ করতে থাকে। মির দুর্গ নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতি এবং সেইসাথে মূর্ত ঐতিহ্য এর একটি চমৎকার নিদর্শন।

অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যান্ড উপকূলে অবস্থিত গ্রেট বেরিয়ার রিফ প্রথিবীর সর্বাধিক প্রসারিত প্রবালপ্রাচীর। মকরক্রান্তি রেখার ঈষৎ দক্ষিণ থেকে শুরু হয়ে এই প্রবাল প্রাচীর পাপুয়া নিউ গুয়েনার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩৪০০ একক প্রাচীরের সমাহার যার মধ্যে ৭৬০ টি ঝোলানো পারযুক্ত প্রাচীর যেগুলির আয়তন ১ হেক্টর থেকে ১০,০০০ হেক্টর পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়া পূর্ব উপকূলে প্রায় ২০০০ কি. মি. জুড়ে এই প্রবাল প্রাচীরের বিস্তার। সামুদ্রিক ভূপ্রকৃতির অসংখ্য অভিনব কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও জীব বৈচিত্র্য এই প্রবাল প্রাচীরে দেখা যায় যেমন ৩০০ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রবাল এবং ৬১৮টি মহাদেশীয় দ্বীপ যা একদা মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই প্রবাল প্রাচীর ১৫০০ প্রজাতির মাছ, ৪০০ ভিন্ন প্রজাতির প্রবাল, ৪০০০ প্রজাতির সামুদ্রিক মোলাস্কা (যেমন অক্টোপাস, শামুক, ইত্যাদি) এবং ২৪২ প্রজাতির পাখি, রকমারি স্পঞ্জ, সামুদ্রিক কেঁচো, বায়ুপরাগী পুষ্প, খোলযুক্ত বা কবচী সামুদ্রিক প্রাণীর আবাস এর মধ্যে অসংখ্য বিরল এবং বিপন্ন। এই প্রবালপ্রাচীরে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে নানান প্রজাতির তিমি, ডলফিন, সবুজ বিবদমান কচ্ছপ। এই জীববৈচিত্র্য, চিত্তবিনোদনমূলক ক্ষমতা, অস্তিত্বরক্ষার জন্য গুরুত্ব,, জীবিকা নির্বাহের উৎস এবং সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণা প্রদান -এরূপ নানান দিককে পর্যালোচনা করে ইউনেসকো গ্রেট বেরিয়ার রিফকে বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র বা 'World Heritage Site' এর মর্যাদা প্রদান করে। গ্রেট বেরিয়ার রিফ মূর্ত হলেও তা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য কিন্তু নানান কারণে কুইন্সল্যান্ড উপকূলভাগে বসবাসকারী অস্ট্রেলিয় আদিবাসী সমাজের বহু গোষ্ঠীর কাছে এই প্রবাল প্রাচীরের অবদান অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন ধরে ঐ সকল মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে এই প্রবালপ্রাচীরের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে -তারা এখানে প্রবেশ করে, শিকার করে, মাছ ধরে এবং তারপরেও নিজেদের এই প্রবাল প্রাচীরের রক্ষক রূপে মনে করে। ফলে এই প্রবাল প্রাচীরকে 'World Heritage Site' রূপে ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ঐ অঞ্চলের দৈনন্দিন বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক মননকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, পাশাপাশি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রবাল প্রাচীরের চিত্তবিনোদনমূলক আবেদনকেও মর্যাদা দেওয়া হয় - একে রক্ষা করার দায়িত্বও এই ঘোষণার মধে নিহিত থাকে। গ্রেট বেরিয়ার রিফকে 'World Heritage Site' এর স্বীকৃতি প্রদান হয়তো বা আঞ্চলিক সমাজের ঐ

প্রবালপ্রাচীর সম্পর্কিত চেতনার সঙ্গতিপূর্ণ নয় - ঐতিহ্য সম্পর্কিত সরকারী চিন্তাভাবনা ও আঞ্চলিক সমাজের চেতনার মধ্যে একটি দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র বহু ক্ষেত্রেই বিরাজমান থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় ঐতিহ্য বা 'Heritage ' শব্দটির ব্যাখ্যা নানাভাবে করা হয়। ঐতিহ্য'র সরকারী তকমা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত আইনকানুন ঐতিহ্য সম্পর্কিত কোন আঞ্চলিক সমাজের ধারণার সঙ্গে একাত্ম হতেও পারে বা নাও হতে পারে। ঐতিহ্য এই শব্দটিকে বাংলা ভাষায় অনেকভাবে ব্যবহার করা হয় - ঐতিহ্যবাহী পরিবার বা ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা বা ঐতিহ্যমন্ডিত কোনো অনুষ্ঠান ইত্যাদি - বলা বাহুল্য এরূপ 'ঐতিহ্য' অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নিয়মে ও আইনে ঐতিহ্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করে না। যেমন কোলকাতার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার নানা কারণে ঐতিহ্যপূর্ণ - তাদের কাছ থেকেই জোব চার্ণকের রনেতৃত্বাধীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কুঠি তৈরীর জমি কিনেছিলেন আবার তারাই ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কোলকাতায় দুর্গা পূজার প্রচলন ঘটায়। খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে এই পরিবারের উৎসকে সন্ধান করা গেলেও এই পরিবারের ঐতিহ্যের কোনো সরকারী স্বীকৃতি নেই। কিন্তু বাংলার, বিশেষ কোরে কোলকাতার মানুষের চেতনায় কিন্তু ঐ পরিবারের ঐতিহ্য সদাবর্তমান।

সহজেই অনুমেয় যে ঐতিহ্য'র কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা সম্ভব নয়। অধিকাংশ মানুষেরই ঐতিহ্য সম্পর্কিত নিজ নিজ ধারণা আছে এবং অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই তাদের নিজ নিজ ভাবনার ঐতিহ্য'র পাশাপাশি সরকারীভাবে স্বীকৃত ঐতিহ্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় সরকারী ঐতিহ্য রূপে স্বীকৃত কোনো একটি জাতীয় সংগ্রহশালা বা যাদুঘর পরিদর্শনকালে ঐ দেশেরই একজন শিক্ষিত নাগরিক সেই যাদুঘরে সংরক্ষিত এমন অনেক বস্তু দেখতে পাবেন যেগুলিকে তিনি ঐতহ্য বলে এতদিন মনে করেননি। অন্যদিকে ঐ একই যাদুঘরে তিনি এমন অনেক বস্তু দেখতে পাবেন না যেগুলিকে তিনি বা তাঁর সমাজ ঐতিহ্য রূপে মনে করেন। অর্থাৎ ঐতিহ্য সম্পর্কিত ঐ নাগরিকের ধারণার সঙ্গে ঐতিহ্য সম্পর্কিত সরকারী মানদন্ড এর মধ্যে একটি পার্থক্য দেখা যাবে। অঞ্চলভেদে, গোষ্ঠীভেদে এমনকি ব্যক্তিভেদেও ঐতিহ্য সম্পর্কিত ভাবনাগত বা ধারণাগত এই প্রকার তারতম্য অনস্বীকার্য। এইভাবে ঐতিহ্য সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ধারণা এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত সরকারী মানদন্ডের তারতম্য জনিত কারণে গড়ে উঠতে পারে ঐতিহ্য সম্পর্কিত বহুত্ববাদী চেতনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা।

ঐতিহ্য সম্পর্কিত বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা বা বহু ঐতিহ্য'র সমস্যাকে কিছুটা সমাধান করার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্তরে ইউনেসকো গ্রহণ করে। ২০০২ সালটিকে সম্মিলিত জাতিসংঘ বিশ্ব ঐতিহ্য বর্ষ রূপে পরিগণিত করে এবং বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানবসমাজের স্থানীয়, আঞ্চলিক, দেশীয় স্তরে সাংস্কৃতিক গুরুত্বযুক্ত পরম্পরাগত চেতনাকে মর্যাদা দিয়ে ইউনেসকো বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়ের একটি তালিকা তৈরী করে যাকে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করা যায়। বলা বাহূল্য যে এই তালিকা সম্পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত নয় এবং এর বাইরে এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যা ঐতিহ্য'র চিহ্ন বহন করে। তবে ইউনেসকো কর্তৃক প্রদত্ত বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়ের এই নিম্নলিখিত তালিকা সাধারণ মানুষকে ঐতিহ্য সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে পারে।

১) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেন্দ্র যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র, ধ্বংসস্তূপ বা ধ্বংসাবশেষ, ঐতিহাসিক সৌধ বা ভবন।

২) ঐতিহাসিক শহর বা নগর, নাগরিক ভূদৃশ্য এবং অনক্ষয়িত নগর।

৩) সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য যেমন উদ্যান, বাগান, পশুচারণভূমি, খামার, ইত্যাদি।

৪) কোন মানবসমাজ বা মানবগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এমন কোন পবিত্র প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য যেমন পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি।

৫) জলের তলায় মূলত সমুদ্রপৃষ্ঠে পড়ে থাকা কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষত জাহাড়ুবির চিহ্ন বা ডুবন্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ।

৬) সংগ্রহশালা বা যাদুঘর যার অন্তর্ভূক্ত সাংস্কৃতিক যাদুঘর, শিল্প প্রদর্শনীর চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি, কোন ভবনে অবস্থিত সংগ্রহশালা।

৭) অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যাকে স্থানান্তর করা যায় - বৈচিত্রপূর্ণ নানা বস্তু যেমন কোন চিত্র, কোনো মুদ্রা, কোনো যন্ত্র, পাথরের তৈরী কোনো আয়ুধ বা শিল্পকর্ম, ট্রাকটর বা কোনো গাড়ি, রেলের কোনো কামরা বা কোনো একটি ক্যামেরা, ইত্যাদি।

৮) হস্তশিল্প।

৯) তথ্যমূলক ঐতিহ্য এবং ডিজিটাল ঐতিহ্য যেমন মহাফেজখানা বা সংরক্ষণাগার, গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বই এবং ডিজিটাল সংরক্ষাণাগার (Digital archives)

১০) চলচিত্রমুলক ঐতিহ্য অর্থাৎ সিনেমা এবং তার দ্বারা প্রকাশিত ভাবনা।

১১) মৌখিকভাবে অস্তিত্বমান পরম্পরা যেমন পৌরাণিক কাহিনী, বা অতীতের গৌরবগাথা যা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে মৌখিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

১২) অনুষ্ঠান যেমন উৎসব এবং তার মধ্যে নিহীত সাংস্কৃতিক পরম্পরা।

১৩) প্রথা এবং বিশ্বাস যার মধ্যে সম্পৃক্ত ধর্মীয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি

১৪) সঙ্গীত ও গান।

১৫) প্রদর্শিত শিল্পকর্ম যেমন থিয়েটার, নাটক, নাচ ইত্যাদি।

১৬) ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ঔষধ।

১৭) সাহিত্য।

১৮) ভাষা ।

১৯) ঐতিহ্যগত খেলাধূলা।

২০) ঐতিহ্যগত রন্ধনপ্রক্রিয়া বা রন্ধনশৈলী ।

বোঝাই যাচ্ছে যে উপরের তালিকাভূক্ত বিষয়গুলির অনেকগুলি মূর্ত ঐতিহ্য অর্থাৎ যাকে স্পর্শ করা যায় যেমন স্থান, বস্তু, ভবন, সৌধ, পর্বত ইত্যাদি আবার অনেকগুলি বিমূর্ত অর্থাৎ যাকে ধরা যায়না যেমন পরম্পরাগতভাবে চলে আসা প্রথা, আচার, অনুষ্ঠান, শিল্পকর্ম, পেশা ইত্যাদি। আবার এই তালিকায় এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি একইসাথে মূর্ত বস্তু এবং বিমূর্ত আচার বা প্রথাকে প্রকাশিত করে। যেমন দুর্গাপূজা এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে যেমন নির্মীত দুর্গামূর্তি মূর্ত শিল্পসৃষ্টিকে প্রকাশ করে, তেমনই এই পূজার আচার অনুষ্ঠানগুলি পরম্পরাগত আচার অনুষ্ঠানকে বজায় রাখে যা নিঃসন্দেহে বিমূর্ত ঐতিহ্য। সুতরাং কোনো ঐতিহ্যকে শ্রেণীকরণের সময় তার বহুমুখি প্রকাশকে খেয়াল রাখতে হবে। উপরের তালিকায় নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই প্রাধান্য পেয়েছে তবে প্রাকৃতিক এবং বাস্তুতন্ত্রের বা বাস্তুসংস্থানের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নানান বিষয় যেমন গাছপালা বা উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য ও ভূমিরূপ, সমুদ্র ও অন্যান্য জলভাগ বহু ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য রূপে পরিগণিত হয় যেমন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একাংশে অবস্থিত সুন্দরবন। নান্দনিক প্রাকৃতিক শোভা, বাস্তুসংস্থানগত, ভূতাত্ত্বিক এবং জীববৈচিত্রগত গুরুত্বকে অবলোকন করে প্রকৃতির কোনো একটি অঞ্চলকে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করা হয়। প্রাকৃতিক ঐতিহ্যেরও মূর্ত এবং বিমূর্ত উভয় দিক রয়েছে - কোনো একটি অরণ্যের গাছপালা, বন্যপ্রাণী, ভূপৃষ্ঠের গঠন যেমন মূর্তরূপে প্রকাশিত, তেমনই এর প্রাকৃতিক শোভা কেবল উপভোগযোগ্য তাই বিমূর্ত।

ঐতিহ্য'র চিহ্নিতকরণে অপর একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়- ঐতিহ্যরূপে চিহ্নিত বিষয়টি হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়। ভরতপুর এর বায়ানার মুদ্রাগুলি যদি সঠিক সময়ে মাহারাজা উদ্ধার না করতেন তাহলে হয়তো গ্রামবাসীগণ সেগুলির গুরুত্ব না বুঝে গলিয়ে ফেলতে পারতেন এবং এর ফলে গুপ্ত সম্রাটদের অপরূপ সুন্দর সোনার মুদ্রাগুলি সম্পর্কে কিছুই জানা যেত না এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য বহনকারী শিল্পদ্রব্যগুলি নষ্ট হয়ে যেত। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার প্রবালপ্রাচীরকে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত না করে যদি বিরল কচ্ছপগুলিকে রক্ষা না করা যায় তবে তাও একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, একই কথা প্রযোজ্য সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এর ক্ষেত্রেও। অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটি ভবনকে ঐতিহ্য রূপে সংরক্ষণ করা শুরু হয় এই ভীতি থেকে যে ভবিষ্যতে ঐ ভবন নানা কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং লুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভয় যেসকল বিষয়ের আছে এবং যা ঐতিহাসিক, সামাজিক বা প্রাকৃতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাকে সাধারণভাবে ঐতিহ্য'র তালিকাভূক্ত করা হয় যাতে আইনগত দিক দিয়ে তাকে দীর্ঘ সয় ধরে সংরক্ষণ করা যায়।

ঐতিহ্যর ব্যবস্থাপকগণ কেবল বাণিজ্যিক স্বার্থকেই রক্ষা করেন না তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্য সম্পর্কিত ইতিকথা ও পরম্পরার চেতনাও মানবসমাজের মধ্যে জাগানোর চেষ্টা করেন যাতে করে তার জনপ্রিয়তা বাড়ে এবং সেইসাথে তার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসাজনিত লাভ বাড়ে। যেমন ভিক্টোরিয়া মেবোরিয়ালে আলোছায়ার ও শব্দের প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে কোলকাতার অতীত ঐতিহ্যকে দর্শকদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায় এবং তা যদি দর্শকদের দ্বারা আরও বেশী সংখ্যক মানুষের কাছে প্রচারিত হয় তাহলে ঐ প্রদর্শনীর দর্শকসংখ্যা বাড়বে -সেইসাথে টিকিট বিক্রীও বাড়বে। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখিকে বধ করা সম্ভব হবে। শহরের অতীত মাহাত্ম্যও প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে আবার অর্থলাভও হবে।

ঐতিহ্য'র অপর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিপণনে সরকার এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংগঠনসমূহের উদ্যোগ ও ভূমিকা। সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মূর্ত বস্তু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিমূর্ত প্রথা বা আচার বা শিল্পকর্মর সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তাদের সরকারী ঐতিহ্যের তকমা প্রদানের মধ্যে দিয়ে সরকারের ভূমিকা শুরু হয়। এরপর আসে ঐতহ্যক্ষেত্রগুলিকে সংরক্ষণ করা, সেগুলিকে আর্থিক অনুদান প্রদান এবং কিছু স্থানকে পর্যটন কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করা। বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাকে যেমন অনেক সরকারই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে

রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করে। এই প্রয়াসের একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সে ১৯৯৪ সালে তৌবন আইন প্রযোজ্য হয়েছিল তৎকালীন সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যাক তৌবনের উদ্যোগে। ফরাসী পার্লামেন্টে পাশ করা এই আইনে বলা হয় যে ফ্রান্সের সকল প্রকাশনা, মুদ্রিত বিপণন, বিলবোর্ড, কর্মক্ষেত্র, দৈনিক খবরের কাগজ, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সকল বাণিজ্যিক চুক্তিপত্রে ফরাসী ভাষা ব্যতিত অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে ফরাসী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকোজি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে মত প্রকাশ করেন যে ফরাসী রন্ধনপ্রণালীর কয়েকটি ধ্রুপদী ও সর্বোত্তম খাদ্যপ্রণালী বা রন্ধন প্রক্রিয়ার সঠিক বা যথাযথ পদ্ধতিকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য'র তালিকাভূক্ত করার কথা ভাবা যেতে পারে। সেইমতো সরকারী উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়।

এর বাইরে কোন রাষ্ট্রের জাতীয় সরকার সেই দেশ তথা জাতির ঐতিহ্য'র একটি তালিকা তৈরী করে এবং তাকে কিছু সময় অন্তর সংস্করণ করতে থাকে -এইভাবে তৈরী হয় দেশের ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান, বস্তু, লোকসংস্কৃতি বা লোকাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্যতালিকা বা তথ্যনিবন্ধন যাকে সরকারী পরিভাষায় ' Heritage Register' বলা হয়ে থাকে। এইভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ জাতীয় ঐতিহ্য'র যে তালিকা সৃষ্টি হয় তা জাতীয় ইতিহাস ও অতিতের চেতনাকে প্রকাশ করা ও প্রয়োজনে জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো দেশের সরকার তালিকাভূক্ত ঐতিহ্যগুলিকে তাদের গুরুত্ব অনুসারে কতকগুলি স্তর বা ক্রমে ভাগ করে। এইভাবে সরকারী এইভাবে ঐতিহ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত ঐতিহ্য এবং ইউনেসকো কর্তক স্বীকৃত ঐতিহ্য সুনির্দিষ্টিত হয়। ঐতিহ্য রূপে স্থান অধিকারের বা তালিকাভূক্ত হওয়ার নিয়মও তৈরী করে সরকার। যেমন কোনো একটি চিত্রকর্মের নান্দনিক আকর্ষণ ও শৈল্পিক গুণ বিচার করে তাকে ঐতিহ্য রূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিল্প বিশেষজ্ঞগণ। অনুরূপভাবে সুন্দর সাহিত্যের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ভিত্তিতে সাহিত্যের পন্ডিতগণ কোনো একটি সাহিত্যকর্মকে ঐতিহ্য রূপে পরিগণিত করতে পারেন। তবে যেহেতু সৌন্দর্য বা উৎকর্ষতার ধারণাটি আপেক্ষিক সেহেতু তার উপর গড়ে ওঠা আইন বা নিয়মও প্রশ্নাতীত নয়। যেমন প্রশ্ন উঠতে পারে কোনো শিল্পকর্মকে বা কোনো সাহিত্যকে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত করার মানদন্ডগুলি ঠিক কী, কারাই বা এই মানদন্ডগুলি ঠিক করেন, বিচারকদেরই বা কে নিযুক্ত করেন, কিসের ভিত্তিতেই বা তাদের নিযুক্ত করা হয়, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে। পন্ডিতগণের একাংশ মনে করেন যে ঐতিহ্য নির্ধারণের আইনগুলিকে নির্মাণ করা হয় জাতীয় ভাবাবেগ, আদর্শ, চেতনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এবং এই মানদন্ড নির্ধারণে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের মতামতই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বহুমাত্রিক ধ্যানধারণা এবং চেতানকে বিশ্লেষণ করার পরেই ঐতিহ্য নির্ধারণের মানদন্ড স্থিরীকৃত হয়। পাশাপাশি ঐতিহ্য'র ব্যবস্থাপনায় অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক লক্ষ্যও নিহিত থাকে।

সাম্প্রতিক কালে ঐতিহ্য বিষয়ক অ্যাকাডেমিক চর্চায় ঐতিহ্যকে মান্যতা দান বা স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাকে রক্ষণাবেক্ষণের প্রকরণগত বা প্রয়োগকৌশলগত সরকারী অনুশাসন বা নিয়মনীতি বা বিধান এবং তার পেশাগত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি যেমন গুরুত্ব পায় তেমনই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ঐতিহ্য নিয়ে মাতামাতি। আধুনিক কালের অনেক পন্ডিতই সমসাময়িক সমাজে ঐতিহ্য'র গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যেমন ২০০৬ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেজানে স্মিথ লেখেন যে বস্তুতপক্ষে ঐতিহ্য বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই 'there is, really, no such thing as heritage'। সুতরাং যার অস্তিত্বই নেই তাকে কেন্দ্র করে কোনো সরকারী বিধানেরও কোনো দরকার নেই। ঐতিহ্য'র উপযোগিতা নিয়ে এই বিতর্কের সূচনা অবশ্য হয়েছিল ১৯৮০'র দশকের ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে এবং এই বিতর্ক থেকেই ওখানে জন্ম নিয়েছিল ঐতিহ্য চর্চা নামক একটি পৃথক শিক্ষণপদ্ধতি। পরবর্তীকালে বিশ্বের নানা দেশে সমালোচনামূলক ঐতিহ্য চর্চা বা 'Critical Heritage Studies' নিয়ে পড়াশোনা জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। মূলত সেই সকল রাষ্ট্রে ঐতিহ্য চর্চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যেখানে পশ্চিমী কায়দায় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা হয় এবং যে সকল রাষ্ট্র 'World Heritage List' বা বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অংশগ্রহণ করে বিশ্বজুড়ে সক্রিয়া ঐতিহ্য নিয়ে ব্যবসায় নিজেদের সংযুক্ত রাখে। ঐতিহ্য চর্চার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রগুলি চায় যে তাদের দেশেভূক্ত বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর দেশী এবং বিদেশী পর্যটকের আনোগোনা হোক যাতে করতে তা থেকে বাণিজ্যিক বা আর্থিক মুনাফা লাভ করতে পারে। ভারতের সরকার সেই কারণেই রাজস্থানের জয়পুর, যোধপুর, বিকানির বা জয়সলমিরের দুর্গগুলিকে বিশেষ যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেন এবং একই কারণে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনস্ত রেল মন্ত্রক 'Palace on Wheels' নামক অত্যন্ত বিলাসবহুল বিশেষ রেল চালান যার টিকিট ডলারের মত বিদেশী মুদ্রায় কিনতে হয়।

সমালোচনামূলক ঐতিহ্য চর্চা 'Critical Heritage Studies' এ নতুন মাত্রা দেন জনৈক ইংরেজ গবেষক রবার্ট হেইসন (Robert Hewison)। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত The Heritage Industry নামক গ্রন্থে তিনি ঐতিহ্য নামক বিষয়টিকে একটি উৎপাদনশিল্প বা Industry রূপে অবিহিত করেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ঐতিহ্য নামক ধারণা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সমকালীন যুক্তরাজ্যে অতীতের পবিত্রকরণ বা শুদ্ধিকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণের এক প্রচেষ্টা চলছে। তিনি

মত প্রকাশ করেছিলেন যে ঐতিহ্য উপর থেকে চাপানো একটি ধারণা যার মাধ্যমে মধ্যবিত্তের অতীত সংক্রান্ত নস্টালজিয়াকে বা স্মৃতিকে উস্কে দিয়ে দেশের অতীতকে সুবর্ণযুগ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। এবং এই চেষ্টা চলছে এমন একটি সময়ে যখন দেশের অতীত সংক্রান্ত চেতনাটি সাধারণ মানুষরে মনে লুপ্ত হতে বসেছে। হেইসন মনে করেছিলেন যে ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাতামাতি করে এর পৃষ্ঠপোষকগণ সমকালীন সময়ের শিল্প ও সমালোচনামূলক সংস্কৃতির বিকাশের গতি রোধ করেছিলেন এবং অন্যদিকে অতীতে গ্রথিত রয়েছে এরূপ সংস্কৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধারণার প্রেক্ষিতের দিকে তিনি আলোকপাত করেন। এই আপাত অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে অতীতকে অবলম্বন করা অনেক বেশি নিরাপদ ছিল। কিন্তু অতীতকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা তো সম্ভব নয়, তার বদলে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কটা অন্তত স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন যে পরিবারে মানুষ বাস করে সেই পরিবারের ঐতিহ্যের শেকড়কে অনুসন্ধান করা, সামাজিক যে প্রথাগুলি মানা হয়, যেমন ভাষা - তার প্রাচীনত্ব নিরূপন করে তার সাথে বর্তমানের সম্পর্ককে সন্ধান করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বহু ক্ষেত্রে অতীতের সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমানের ফারাক এতটাই বেশি হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমানটিকে অতীতের অবক্ষয়িত রূপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যা কিনা অতীতের শিকড়কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ভীতি সমকালীন মানবমনে সঞ্চারিত করে।

বস্তুতপক্ষে পরিবর্তনের এক প্রেক্ষিতে রবার্ট হেইসন তাঁর The Heritage Industry নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন এবং ঐ পরিপ্রেক্ষিত তাঁর ঐতিহ্য সম্পর্কিত সমালোচনামূলক ভাষ্যের নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অবশিল্পায়ন, বিশ্বায়ন এবং পরিযান, অভিবাসন ও বহুজাতিকতা জনিত পরিবর্তন এবং তৎজনিত সামাজিক সমস্যার এক বাতাবড়ণে হেইসন তাঁর ঐতিহ্য সম্পর্কিত তত্ত্বকে খাড়া করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে শেকড় ছেড়ে আসা নাগরিকদের মধ্যে তাদের অতীত সম্বন্ধে এক বিশেষ নস্টালজিয়া কাজ করছে। হেইসনের তত্ত্বানুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডে এই কারণে অস্তিত্বমান বাস্তব সমস্যার সমাধানের থেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল অতীতকে গৌরবান্বিত করে এবং তাকে পবিত্র হিসাবে কল্পনা করাকে এবং এর মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্য নামক শিল্প উৎপাদনের জন্ম হয় যা তাঁর মতে Utopia বা একটি কাল্পনিক নির্মাণ। হেইসন লিখেছেন, ‘‘The impulse to preserve the past is part of the impulse to prserve the self. Without knowing where we have been, it is difficult to know where we are going. The past is the foundation of the individual and collective identity, objects from the past are the source of significance as cultural symbols. Continuity between past and present creates a sense of sequence out of the aleatory chaos and, since change is inevitable, a stable system of ordered meanings enables us to cope with both innovation and decay. The nostalgic impulse is an important agency in adjustment to crisis, it is a social emollient and reinforces national identity when confidence is weakened and threatened.” (Hewison, 1987, p 47)

রবার্ট হেইসনের প্রায় সমসাময়িক কালের অপর গবেষক প্যাট্রিক রাইট The Heritage Industry প্রকাশের দু বছর আগে প্রকাশ করেছিলেন On Living in an Old Country নামক গ্রন্থখানি যার বিষয়বস্তু প্রায় এক। হেইসনের মতো রাইটও সমসাময়িক ব্রিটেনের অতিরিক্ত পরিমাণে যাদুঘর নির্ভরতার সমালোচনা করেছিলেন - তিনি এই প্রেক্ষিতে Museumification অভিধাটি ব্যবহার করেন এবং বলেন যে ঐতিহ্য নিয়ে মাতামাতি বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে দেবে। তিনি সমালোচনা করে বলেন যে ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার কর্তৃক জারি করা ঐতিহ্য সংক্রান্ত আইন বা বিধানসমূহ বস্তুত ১৯৮২ সালের ফকল্যান্ড সংকটের আবর্তে দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলার একটি প্রয়াস যেখানে অতীত ঐতিহ্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আটলান্টিকের ফকল্যান্ড ও অন্য দুটি লাগোয়া দ্বীপকে নিয়ে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ৭৪ দিন যুদ্ধ চলেছিল। রাইটের মতে ঐতিহ্য’র মাধ্যমে অতীতকে জাগ্রত করার সব থেকে বড় ত্রুটি হল এই কালানুক্রমের অভাব যাকে তিনি বলেছিলেন Timelessness । ঐতিহ্য’র সমালোচক রূপে তিনি লিখছেন, ‘‘National heritage involves the extraction of history – of the idea of historical significance and potential –from a denigrated everyday life and its restaging or display in certain sanctioned sites, events, images and conceptions. In this process history is redefined as the *historical*, and it becomes the object of a similarly transformed and generalized public attention…. Abstracted and redeployed, history seems to be purged of political tension; it becomes a unifying spectacle, the settling of all disputes.

Like the guided tour as it proceeds from site to sanctioned site, the national past occurs in a dimension of its own – a dimension in which we appear to remember only in order to forget.'' (Wright, 1985, p 69)

অর্থাৎ হেইসনের মত রাইটও অভিযোগ করলেন যে ঐতিহ্য'র ব্যবস্থাপনা আসলে সাধারণ মানুষের মন থেকে বর্তমানের সমস্যাগুলিকে মুছে ফেলার প্রয়াস। ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থা ও বিপনণের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে হেইসন আরও লিখছেন যে ''Heritage… has enclosed the late twentieth century in a bell jar into which no ideas can enter, and, just as crucially, from which none can escape. The answer is not to empty the museums and sell up the National Trust, but to develop a critical culture which engages in a dialogue between the past and the present. We msut rid ourselves of the idea that the present has nothing to contribute to the achievements of the past, rather, we msut accept its best elements, and improve on them…. The definition of those values must not be left to a minority who are able trough their access to the otherwise exclusive institutions of culture to articulate the only acceptable meanings of the past and the present. It must be a collaborative process shared by an open community which accepts both conflict and change." (Hewison, 1987, p 144)

ঐতিহ্য মানবমনে অতীত সম্পর্কে অসত্য বা ভ্রান্ত ধারণা মুছে দিয়ে ইতিহাসের সঠিক রূপ তুলে ধরে। এবং একইসাথে ঐতিহ্য নস্টালজিয়া ও স্মৃতিবিজরিত উদ্বেগকে প্রশমিত করে ইতিহাসের যথাযথ ও মূর্ত উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে। হেইসন ও রাইট ঐতিহ্য বিষয়ক চর্চায় ঐতিহ্যের এই দুটি উপযোগিতাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে নস্টালজিয়া ও অতীত সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা এক নয়। এবং দ্বিতীয়ত, তারা বলেন যে ঐতিহ্য'র মধ্যে দিয়ে ইতিহাস তথা অতীতকে যতো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হোক না কেন, তা সর্বদাই একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে করা হয়ে থাকে। ঐতিহ্য'র মধ্যে দিয়ে সরকারী সরকারী উদ্যোগে যে অতীত উদ্ভাসিত হয় তা শুধু 'bogus history' নয় তা একদিকে বিশ্বায়ন এবং অন্যদিকে স্থানীয় বাধ্যবাধ্যকতার মধ্যে পড়ে একটি বিশেষ ধরণের একমুখী জাতীয় ভাষ্য নির্মাণ করা। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে বিশ্বায়ন, অভিবাসন এবং বহুজাতিকতার প্রতিঘাতে যখন জাতীয় রাষ্ট্রচেতনা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তখন ঐতিহ্য' নামক ধারণা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে তাকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। জাতীয় স্বার্থের মুখোশের আড়ালে ঐতিহ্য নামক ধারণার মধ্যে দিয়ে একগুচ্ছ সামাজিক, ধর্মীয়, এবং রাজনৈতিক বিধান নির্মিত হয় যার দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিয়ন্ত্রন করতে পারে - ঐতিহ্য সেই নির্মাণের প্রক্রিয়ায় একটি যন্ত্র মাত্র যার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন ও অতীতের রাষ্ট্রীয় নীতিকে একাত্ম করার চেষ্টা করা হয়।

একটি জনপ্রিয় সংস্কৃতি হিসাবে ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে হেইসনের তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেন ব্রিটিশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক র‍্যাফায়েল স্যামুয়েল ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত 'Theatres of Memory' গ্রন্থে। তিনি বলেন যে অতীত সম্পর্কে সাধারণ মানষের একটি আকর্ষণ রয়েছে এবং সমাকলীন সামাজিক রূপান্তর ও বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহ্য সম্পর্কিত হেইসনের রক্ষণশীল রাজনীতির স্বার্থজনিত তত্ত্বকে তিনি খারিজ করে দেন। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঐতিহ্য'র নির্মাণ হয়নি, ঐতিহ্য'র সঙ্গে অতীতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে কারণ ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়েই অতীত গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে কারণ ঐতিহ্য'র মধ্যে দিয়ে অতি সাধারন মানুষের জীবনও প্রকাশিত হয়। হেইসন রাজনৈতিক সংকটের যে পর্যায়ে ঐতিহ্য নামক ধারণার উত্থানকে স্থান দিয়েছিলেন, র‍্যাফায়েল স্যামুয়েল তার বহু আগেই ঐতিহ্য নামক ধারণার উৎসকে সন্ধান করেন ও স্থান দেন।

সমকালীন ইংল্যান্ডে খামার বাড়ি বা 'Country House' এর মাধ্যমে ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদাহরণ দিয়ে স্যামুয়েল দেখান যে 'National Trust' এর এই উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ ঐতিহ্যকে চমৎকারভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে ঐতিহ্যবাহী খামারবাড়িগুলি সংরক্ষণের সময় সিঁড়ির নীচে পরিচারকদের রান্নাঘরগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে -অর্থাৎ উপরতলার ধনী খামারবাড়ির মালিকদের সঙ্গে নিচুতলার দরিদ্র পরিচারকদের সমাবস্থানকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা খামার বাড়ির সামাজিক অতীতকে প্রকাশিত করেছে এবং তাতে দরিদ্র পরিচারকদের বসতিকে তুলে ধরে ঐতিহ্যকে অনেক বেশী গণতান্ত্রিকতার সাথে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং এরূপ উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্য সমাজের যে কোন স্তরের মানুষকে অতীতে অস্তিত্বমান তার নিজস্ব সামাজিক স্তরের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করে - যেমন খামার পরিদর্শনকালে এখনকার পরিচারক পরিবারের একজন ব্যক্তি খামারবাড়িতে

তার পূর্বপুরুষদের জন্য তৈরী নির্দিষ্ট অংশটিকে বুঝতে পারেন এবং এর ফলে ঐ খামারবাড়ির উপরতলের ধনী সমাজের অতীতের মধ্যে তাঁর নিজের অতীতকে খুঁজতে হয়না।

স্যামুয়েল ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করেছেন সামাজিক রূপান্তরের একটি যন্ত্র রূপে। তিনি মনে করেন যে ঐতিহ্য সমাজের বহুসাংস্কৃতিকতা এবং সামাজিক বৈচিত্র্যকে প্রকাশিত করে। ঐতিহ্য'র সংরক্ষণের উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করে তিনি লিখছেন, ''Conservation is not an event but a process, the start of a cycle of development rather than (or as well as) an attempt to arrest the march of time. The mere fact of preservation, even if it is intended to do no more than stabilize, necessarily involves a whole series of inventions, if only to arrest the *pleasing decay*. What may begin as a rescue operation, designed to preserve the relics of the past, passes by degree into a work of restoration in which a new environment has to be fabricated in order to turn fragments into a meaningful whole.''। (Samuel, 1994, p- 303)

জনপ্রিয় সংস্কৃতি রূপে ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করার যে প্রয়াস স্যামুয়েল করেছেন তার বিরোধিতা করা সহজ নয় কারণ একেবারে নিচুতলার মানুষ বা তৃণমূল স্তরের মানবগোষ্ঠী তাদের নানা প্রকারের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা চালায় বা সরকারের কাছে আর্জি জানায়। এর দ্বারা ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি সাধারণ মানুষের সদিচ্ছাই ফুটে ওঠে। যেমন গ্রামবাংলার নানারূপ আঞ্চলিক বা স্থানীয় সংস্কৃতি যেমন বাউল গান বা বাউলের ব্যবহার করা একতারা বা দোতারা, বা কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুড়িয়ার মত মিষ্টি বা প্রাচীন কোনো মন্দির বা মসজিদকে তৃণমূল স্তরের মানুষগণই ঐতিহ্য'র মর্যাদা দিয়ে বংশ পরম্পরায় আগলে রেখেছেন ও রাখছেন। আবার অন্যদিকে উন্নত পশ্চিমী রাষ্ট্র ইংল্যান্ডে ১৯৭৪ সালে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট সংগ্রহশালার উদ্যোগে আয়োজিত 'The Destruction of the Country House' নামক প্রদর্শনীর প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটেনের ঐতিহ্য রক্ষাকল্পের জন্য ও ঐতিহ্য রক্ষার চেতনাকে প্রচার করার জন্য একটি সংগঠন তৈরী হয় যার নাম 'SAVE Britian's Heritage'। বলা বাহুল্য যে সকল শিক্ষিত ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি ঐ প্রদর্শনী দর্শন করেছিলেন তারাই এই প্রচার আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। অর্থাৎ গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবি সমাজ - সকলেই নিজ নিজ এলাকার বা সমাজের বা গোষ্ঠীর এমনকি পরিবারের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের চেষ্টা করে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিঃসন্দেহে একটি জনপ্রিয় সংস্কৃতি।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সমাজবিদ জন উরি লেখেন 'The Tourist Gaze' যে গ্রন্থে তিনি ঐতিহ্য সংক্রান্ত রাইট ও হেইসনের 'false history' এর তত্ত্বকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। হেইসন এবং রাইট তাদের নিজ নিজ তত্ত্বে মত প্রকাশ করেছিলেন যে ঐতিহ্য নামক উৎপাদন শিল্প বা 'heritage industry' এর মধ্যে দিয়ে বিশেষ স্বার্থে নির্মিত অতীতের প্রতি দর্শকদের আকৃষ্ট করা হয় এবং অন্ধভাবে তা বিশ্বাস করার জন্য বাধ্য করা হয়। উরি এই তত্ত্বকে সদর্থকভাবে প্রকাশ করার জন্য উত্তরাধুনিক ফরাসী চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর 'the gaze' এর ধারণাকে ব্যবহার করে একটি নতুন অভিধা নির্মাণ করেন যাকে তিনি নাম দেন 'tourist gaze'। 'tourist gaze' বা পর্যটকের দর্শন হল এমন একটি ধারণা বা অবস্থা যা একজন পর্যটককে পারিপার্শ্বিক বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় কোন একটি স্থানের ভ্রমণমূলক দর্শনের নান্দনিক এক পৃথক বহির্জগতে। পর্যটকের মনে ঐ স্থান সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণার জন্ম দেওয়া হয় দূরদর্শন, ছবি, বিপণন ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আকর্ষণ তৈরীর মাধ্যমে। বই, পত্রিকা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, তথ্যচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে পর্যটন শিল্প ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি সম্পর্কে নিরন্তর প্রচার চালিয়ে যায় এবং এক শ্রেণীর মানবমনে ঐ স্থানগুলি সম্পর্কে একটি অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। উরি তাঁর তত্ত্বে বলেন যে পর্যটকের দর্শন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হওয়া কোনো অভিব্যক্তি নয়, বরং এই দর্শনের উদ্ভব ঘটে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে। তিনি লেখেন যে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তিগত স্তরে ভ্রমণের প্রবণতা বাড়ে। তবে তারও আগে থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বহু শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ইওরোপীয় পর্যটকই নানান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 'Grand Tour' বা বৃহৎ ভ্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করতেন।

ঐতিহ্যের মূলগত একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে এবং এর ফলে ঐতিহ্য ও পর্যটনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে ঐতিহ্যকে প্রচারের জন্য পর্যটনশিল্পকে ব্যবহার করা হয় এবং তার জন্য প্রশাসনিক তরফে আর্থিক অনুদানও দেওয়া হয়। ভারতে ঐতিহ্যবাহী সৌধগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণের মত সরকারী সংস্থাগুলি যথেষ্ট খরচ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে কেবল দিল্লী ও তৎসন্নিহিত এলাকার ঐতিহাসিক সৌধগুলিকে রক্ষা করার জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অন্যদিকে কোন এলাকা

বা রাষ্ট্রের পর্যটন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলেও সেই স্থান বা রাষ্ট্রের ঐতিহ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কারণ ঐতিহ্যের টানেই পর্যটক সংখ্যা বাড়বে এবং পর্যটনজনিত আয় বাড়বে। সুতরাং ঐতিহ্য ও পর্যটনের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই। পর্যটন ও রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয় এবং দর্শকদের চোখে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্য এবং পর্যটনের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস খুঁজতে অবশ্য ফিরে যেতে হবে বহুকাল আগে পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দের গ্রীক জগতে। ইতিহাসের জনক রূপে খ্যাত হেরোডোটাস ঐ সময় তৈরী করেছিলেন বিশ্বের সাতটি আশ্চর্যের একটি তালিকা, ভূমধ্যসাগরের চারপাশের সৌধগুলির তালিকা এবং এই তালিকাগুলি পরে হেলেনীয় নিদের্শপুস্তক বা 'guide book' গুলিতে প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগে হেরোডোটাসকৃত প্রকৃত তালিকাটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। হেরোডোটাসকৃত তালিকার সঙ্গে ইউনেসকো দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের তালিকার মূল পার্থক্য হল এই যে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরী ইউনেসকোর তালিকাটি বিশ্বায়ন, পরিযান বা অভীপ্রয়াণ ও বহুজাতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল যা ঐতিহ্য সম্পর্কিত পশ্চিমী ধারণাকে প্রকাশ করে। ঐতিহ্য সম্পর্কিত এই পশ্চিমী ধারণার উপর গড়ে ওঠা বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকা সমগ্রট বিশ্ব জুড়ে অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইউনেসকো দ্বারা কৃত তালিকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য - এই তালিকা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এর ব্যবস্থাপকগণ নতুন নতুন স্থান, বস্তু এবং অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও প্রাকৃতিক বিষয়কে এই তালিকায় স্থান দিতে শুরু করেছেন যার ফলে নানা প্রকারের ঐতিহ্য ও তার জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকা তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে। এই প্রকার তালিকার নির্মাণকে সমালোচকগণ 'fetishitic creation' বলে ব্যঙ্গ করেছেন কারণ এই নির্মাণে কল্পনা, অন্ধভক্তি, অস্বাভাবিক অনুরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহ্য'র তালিকার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই হেইসনের মত সমালোচকগণ 'museumification' বা যাদুঘরীকরণ এবং 'commodification' বা পণ্যদ্রব্যীকরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

ঐতহ্যকে একটি উৎপাদন শিল্প রূপে দেখার পশ্চিমী প্রয়াসটিকে সহজেই বোঝা যায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিধান প্রস্তুতকারী সংগঠন বা সংস্থার অস্তিত্ব দিয়ে। বস্তুতপক্ষে কেবল পশ্চিমী দুনিয়ায় এরূপ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিধান প্রস্তুতকারী সংগঠনের সংখ্যা অনেক - কাউন্সিল অফ ইওরোপ (Council of Europe), দ্য ইন্টারন্যাশানাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম (The International Council of Museums - ICOM), দ্য ইন্টারন্যাশানাল কাউন্সিল অন মনুমেন্ট অ্যান্ড সাইটস্ (The International Council on Monuments and Sites - ICOMOS), দ্য ইন্টারন্যাশানাল কমিটি অন আর্কিওলজিক্যাল হেরিটেজ ম্যানেজমেন্ট (The International Committee on Archaeological Heritage Management –ICAHM under ICOMOS), দ্য ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনস্ অ্যান্ড ইন্সটিটিউশনস্ (The International Federation of Library Associations and Institutions- IFLA), দ্য অরগানাইজেশন্ অফ ওয়ালর্ড হেরিটেজ সিটিস্ (The Organisation of World Heritage Cities - OWHC), দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ এডুকেশন, সাইনটিফিক অ্যান্ড কালচারাল অরগ্যানাইজেশন্ (the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization-UNESCO), এবং ওয়ালর্ড মনুমেন্টস্ ফান্ড (World Monuments Fund - WMF) । পাশাপাশি নিম্নলিখিত চিত্রলেখ বা রেখচিত্রের মাধ্যমেও দেখা যায় যে ১৮৭০ থেক ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়কালে দশকভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রকাশিত বা জারি করা বিধানের সংখ্যাবৃদ্ধি।

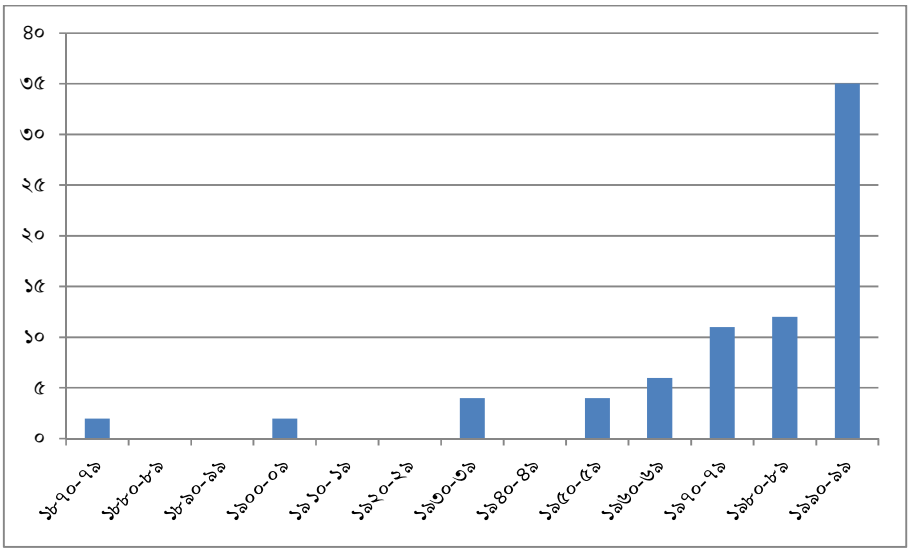

গেট্টি কনশারভেশন্ ইন্সন্টিটিউট প্রদত্ত ২০০৮ সালের তথ্যানুসারে তৈরী দশকভিত্তিক উপরোক্ত রেখচিত্র'র উপর ভিত্তি করে অতি সহজেই বোযা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বা অন্যভাবে বললে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষত, ১৯৬০ থেকে ১৯৯৯ এর মধ্যে সব থেকে বেশি ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিধান প্রকাশিত হয়েছে বা জারি করা হয়েছে।

জন উরি আসলে দেখাতে চেয়েছিলেন যে যাদুঘরের সামাজিক মূল্য নির্ভর করে পর্যটক ও দর্শককূলের উপর। তাঁর মতে দর্শক-পর্যটকগণই ঠিক করেন যে কোনটি ঐতিহ্য এবং কোনটি ঐতিহ্য নয়। যে কোনো স্থানে যা কিছু দিয়ে সংগ্রহশালা বা যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করলে চলে না কারণ সংগ্রহশালার ক্রেতারূপ পর্যটক বা দর্শকগণ সেই যাদুঘরের বিশ্বাসযোগ্যতাকে গুরুত্ব দেন। সুতরাং উরি মনে করেন যে জনপ্রিয় বা সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা ও চাহিদার উপর ঐতিহ্য' নির্ভরশীল। হেইসন এবং রাইটের মতো সমালোচকগণ ঐতিহ্য'র এই জনপ্রিয় চাহিদার দিকটিকেই অনুধাবন করতে পারেননি। ইংল্যান্ডে 'National Trust' কে তাঁরা আখ্যা দিয়েছিলন উচ্চবিত্ত সমাজের গ্রামীন পৈত্রিক সম্পত্তির আধার খামার বাড়িগুলিকে রক্ষা করার ত্রাণমূলক এক ব্যবস্থা হিসাবে। কিন্তু অন্যদিকে স্যামুয়েল দেখিয়েছেন যে 'National Trust' এই সংরক্ষণ আন্দোলনের শরিক বা সমর্থক ছিলেন প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ - অর্থাৎ খামার বাড়িগুলি সংরক্ষণের বিষয়টি জনমানসে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়েছিল এবং এর ফলে খামারবাড়ি বা 'Country House' গুলিকে ঐতিহ্য রূপে সংরক্ষণের প্রয়াসও সফল হয়েছিল। ' National Trust' এর উদ্যোগে সাধিত প্রথম পর্বের অনেক সংরক্ষণের চরিত্রই ছিল 'Plebian' যা অন্ত্যজ বা সাধারণ মানুষের কল্পে নির্মিত, যেমন - রেলগাড়ি সংরক্ষণ, শিল্প বিপ্লব এর বস্তুগত চিহ্নসমূহ সংরক্ষণ, পুরাতন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নিয়ে র‍্যালি ইত্যাদি যা ১৯৬০ এর দশক থেকে আয়োজিত হত এমন এক সময়ে যখন ঐগুলির ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

জন উরি আমাদের বুঝতে সাহায্য করেন যে ঐতিহ্য'র নির্মাণে সাধারণ মানুষ বা দর্শকের চিন্তভাবনা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি উদাহরণ দিয়ে ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের এই আবেগকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বজুড়ে, বিশেষত পশ্চিমী দুনিয়ার নানা স্থানে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল যার নাম ''Treasures of Tutankhamun tour''। এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের কিশোর রাজা তুতেনখামেন'র সমাধি থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ। এই প্রদর্শনী ১৯৭২ এ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ১৬ লক্ষ মানুষ তা দর্শন করেছিল, পরে মার্কিন মুলুকে যখন এই প্রদর্শনী হয় তখন তার দর্শকসংখ্যা বেড়ে হয় ৮০ লক্ষ। ২০০৫ থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় একই বিষয় নিয়ে ' Tutankhamun and the Golden Age of the Pharaohs ' নামে অপর একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মজার বিষয় এই প্রদর্শনী যখন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু আর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এর আয়োজন করা হয়নি। প্রদর্শনীটি হয়েছিল দক্ষিণ পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত বাণিজ্যিক বিনোদন কেন্দ্র 'O_2Dome' এ যেখানে সিনেমা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান বা কনসার্টের মত জনপ্রিয় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে কিভাবে ঐতিহ্যের উপস্থাপন যাদুঘরের চারদেওয়ালের বাইরে আরও অধিক পরিমাণের দর্শকের কাছে উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছিল - প্রদর্শনীটির জনপ্রিয়তা না থাকলে বাণিজ্যিক বিনোদন কেন্দ্র প্রদর্শনীর আয়োজকগণ কখনোই অধিক খরচ করে ভাড়া নিতেন না।

জন উরি ঐতিহ্যের বাণিজ্যিকীকরণের যুক্তি দিয়ে যেমন তার জনপ্রিয়তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তেমনই অন্যদিকে এই বাণিজ্যিকীকরণের কারণেই ঐতিহ্যকে অসার বলে চিহ্নিত করেছেন একাধিক পন্ডিত। বলা বাহুল্য তাঁর একদিকে হেইসন এবং অন্যদিকে রাইট প্রদত্ত 'Heritage Industry' এর তত্ত্বকেই মান্যতা দিয়েছেন। বাণিজ্যিক স্বার্থে বিপণনযোগ্য ঐতিহ্য'র সমলোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ কেভিন ওয়ালস্ এবং ডেভিড লোয়েনথাল। কেভিন ওয়ালস্ ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'The Representation of the Past' নামক গ্রন্থে এবং ডেভিড লোয়েনথাল ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'The Past is a foreign Country' এবং ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত 'The Heritage Crusade and the Spoils of History' নামক গ্রন্থে প্রায় সমরূপ মত প্রকাশ করে বলেছেন যে যত বেশি ঐতিহ্যকে বিপণনযোগ্য করে বিক্রী করার চেষ্টা করা হয় তত সাধারণ দর্শকদের তাদের প্রকৃত অতীত থেকে দূরে সড়িয়ে নিয়ে হয় কারণ ঐতিহ্য'র মধ্যে দিয়ে কোনো এক বিশেষ স্বার্থে নির্মিত অসত্য অতীতকেই জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কেভিন ওয়ালস্ মনে করেন যে জ্ঞানদীপ্তির পর থেকেই বিশ্বজোড়া বাজারের চাহিদার অভিঘাতে সাধারণ মানুষের মনে স্থানবাচক ধারণার অবলুপ্তি বা অপমৃত্যু ঘটেছে এবং অতীতের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়েছে। এই প্রেক্ষিতেই অতীতের সঙ্গে দূরত্বকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঐতিহ্য নামক ধারণার জন্ম দেওয়া হয়েছে যা বস্তুতপক্ষে প্রকৃত অতীতে বা ইতিহাস এর থেকে চরিত্রগত দিক দিয়ে পৃথক।

ঐতিহ্য'র ধারণা সম্পর্কিত বিতর্ক শুরু করা হয়েছিল প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেজানে স্মিথ এর বিখ্যাত বক্তব্য 'there is, really, no such thing as heritage' দিয়ে। এই বিতর্কে পন্ডিতগণের বিভিন্ন তত্ত্বকে সংক্ষেপে আলোচনার পর ফিরে আসা যাক স্মিথের বক্তব্যে। ঐতিহ্য'র কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই এবং ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে কেবল মতামত থাকতে পারে এরূপ মত প্রকাশের সাথে সাথে স্মিথ ঐতিহ্য সংক্রান্ত ধারণার সেই মডেলটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যেখানে ঐতিহ্যকে কোনো স্থান, বস্তু বা রীতি বা আচারের স্বকীয় মূল্যের ভিত্তিতে দেখার, বোঝার বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়। ঐতিহ্য'র স্বকীয় বা অন্তর্জাত মূল্য সেই স্থান, বস্তু বা রীতি বা আচারের মধ্যেই নিহিত থাকে - উক্ত উপাদানের মৌলিক বা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যই তার স্বত্ত্বা বা স্বকীয় অস্তিত্বটিকে নির্মাণ করে। ঐতিহ্যর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত পেশাদারী ব্যক্তিবর্গ যেমন স্থপতি, শিল্পী, প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও যন্ত্রকুশলীগণ ঐতিহ্য'র উপাদানের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তার মূল্য নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করেন। সময়ের সাথে সাথে এই মূল্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা নিয়ে আর প্রশ্ন তোলা হয় না। উক্ত পেশাদারদের ঐতিহ্য নির্ধারণে যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা থেকে মনে হয় যে আগে থেকেই স্থিরীকৃত কিছু মানদন্ডের উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা কেবল ঐতিহ্য'র স্থান বা বস্তু বা সাংস্কৃতিক আচার বা প্রথাটিকে উন্মোচিত করছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে মনে হতে পারে যে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি যেন বর্গীকরণ সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে -অর্থাৎ আগে থেকেই নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো স্থান বা বস্তু বা সাংস্কৃতিক আচার বা প্রথা ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত কোন স্থান বা বস্তু বা সাংস্কৃতিক আচার বা প্রথা তাঁর সহজাত চারিত্রিক গঠন ও বস্তুগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই মূল্যায়িত হয়। এই মূল্যায়ন যদি পরিবর্তনশীল না হয় তাহলে ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিতকরণের মানদন্ড বা বিধানগুলিও অপরিবর্তনশীল হয় এবং এর ফলে ঐতিহ্য সংক্রান্ত একমুখী ব্যাখ্যা তৈরী হয়।

স্মিথ ঐতিহ্য সম্পর্কিত একমুখী ধ্যানধারণাটিকেই অস্বীকার করেছেন এবং আধুনিককালের ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষকগণও ঐতিহ্য'র বহুমুখী বিশ্লেষণকেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন যে ঐতিহ্য'র কোন স্বকীয় মূল্য নেই, তা নির্ভর করে কোন এক বিশেষ স্থানের, বিশেষ সময়ের, বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ কোনো একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান বা বস্তু বা সাংস্কৃতিক আচার বা প্রথাকে কিভাবে দেখচেন তার উপর। স্বাভাবিক ভাবেই স্থান কাল ও পাত্র ভেদে এই দেখা পাল্টে যেতে পারে এবং তার ফলে সৃষ্টি হতে পারে ঐতিহ্য'র বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা। স্মিথ বলেন যে ঐতিহ্যবাদী বস্তুর ক্রমাগত ও নিরন্তর নব নব বিশ্লেষণ চলতে পারে এবং এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই ঐতিহ্য নির্ধারণের নতুন নতুন মাপকাঠি তৈরী হবে। সুতরাং ঐতিহ্য'র অন্তর্ভূক্ত স্বকীয় স্বত্ত্বার সাথে সেই সত্ত্বার প্রতি পরিবর্তনশীল মানুষ তথা সমাজের মূল্যায়ণ কি হবে তার উপরেই নির্ভর করবে ঐতিহ্য'র ধারণা এবং তা নিশ্চিতভাবেই বহুমুখী হবে।

বিংশ শতকের শেষার্ধ থেকেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রচুর মানবগোষ্ঠী জাতিগত বা ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে এক স্থান থেক অন্য স্থানে পরিযান বা অভিপ্রয়াণে বাধ্য হচ্ছে, ফলে ভেঙ্গে পড়ছে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সীমান্তগুলি। তাদের নস্টালজিয়াকে মর্যাদা দেওয়া, সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতাকে সম্মান প্রদান ইত্যাদির আবর্তে ঐতিহ্য সংক্রান্ত বহুমাত্রিক ধারণা বা প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণাকেই আজকের বিশেষজ্ঞমহল মান্যতা দিয়েছেন। একমাত্রিক বিধান বা নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য সম্পর্কিত পূর্ব নির্ধারিত ব্যাখ্যা এখন পরিত্যক্ত। এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রনিযুক্ত এবং রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণকারী ঐতিহ্য'র নির্ধারক পেশদারগণের পক্ষে নানান মানবগোষ্ঠীর বৈচিত্রপূর্ণ আবেগকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এইকারণে প্রতিনিধিত্বমূলক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে বৈচিত্রপূর্ণ মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি ও আবেগের সঙ্গে যুক্ত বস্তু বা স্থান বা লোকাচার বা লোকসংস্কৃতিকে মান্যতা যেমন দেওয়া হয়, তেমনই

ঐ ঐতিহ্যগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করাও সম্ভব হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক ঐতিহ্য তাঁর সামাজিক গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে প্রচলিত ঐতিহ্য'র তালিকার মত প্রতিনিধিত্বমূলক ঐতিহ্য'র তালিকা নির্মাণও দাঁড়িয়ে থাকে বর্গীকরণ সূত্রের উপর। বিশ্বায়নের যুগে অতি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীও তার সামাজিক ও গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়ে রক্ষা করতে চায় - স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্য'র তালিকা পরিপ্লুত বা জারিত হয়ে পড়তে পারে। তাই বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন যে ঐতিহ্য'র সংস্থান তার মানদন্ডের উপর ভিত্তি করেই তৈরী হতে পারে।